International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-V, September 2024, Page No.72-79
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i5.2024.72-79

‘কথামানবী’র ভাষ্যকার কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত

ড. মৌসুমী পাল
সহযোগী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত

Abstract:
Poet Mallika Sengupta is known as a rebel in Bengali poetry circles. Mallika is a daring and independent poet. Women occupy much space in her poetry. Everything can be said without saying much In her writings, the poet has unitedly protested the humiliation of all the humiliated and oppressed women of that era. Her carefree style of expression in the form of writing does not know how to stop. Because she is a rebellious storyteller. She has been writing for ages. From the Puranas to the modern era, women are also featured in the poet's poetry. The protesting women of poet Mallika Sengupta's 'Kathamanavi' have been included in my discussion. This poetry contains the stories of Khana, Draupadi, Ganga, Rizia, Medha Patekar, Madhavi, Malati and Shahbanu. The poet is very aware of her poetry. Her feelings are very strong. The poet's keen feelings and awareness have been captured in the poem 'Kathamanavi'.

Keywords: Kathamanavi, protestant, fighter, brave, Vasyokar.

মূল প্রবন্ধ: মল্লিকা সেনগুপ্ত বাংলা কবিতার আসরে বহু আলোচিত একটি নাম। চিন্তায়, ভাবনায়, কবিতার বিষয় নির্বাচনে, শব্দ ব্যবহারে, যিনি অত্যন্ত বেপরোয়া ও সাহসিনী। সমাজতত্ত্বের অধ্যাপিকা মল্লিকা সেনগুপ্ত কাব্য পাঠকের দৃষ্টি কেড়েছিলেন ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘চল্লিশ চাঁদের আয়ু’ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। সেই শুরু থেকে আজও তাঁর অবিরাম পথ চলা। ১৯৮৫ সালে বিয়ের দিনে স্বামী সুবোধ সরকারের তেরোটি কবিতা ও নিজের লেখা তেরোটি কবিতা মিলে মোট ছাব্বিশটি কবিতা নিয়ে ‘সোহাগ-শর্বরী’ নামে একটি কাব্যগ্রন্থ বের হয়। এরপরে মল্লিকা সেনগুপ্তের লেখনী আর থেমে থাকেনি।

কবি নিজেই তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ কাব্যগ্রন্থের পূর্বকথায় লিখেছেন – “একটি মেয়ে খানাখন্দ পেরিয়ে গ্রামপথে লণ্ঠন হাতে নিয়ে বয়স্ক ইস্কুলে অ আ ক খ শিখতে চলেছে, পালিয়ে যাওয়া বরকে চিঠি লিখবে বলে। এক মহিয়ষী বছরের পর বছর নর্মদার তীরে দাঁড়িয়ে মহাবাঁধ প্রকল্পে উৎখাত হতে থাকা মানুষদের জন্য লড়াই করছে। একজন মহাকাব্যের নায়িকা আড়াই হাজার বছর আগে দণ্ডকারণ্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিরস্ত্রীকরণের কথা বলেছিল। এরাই আমাকে কবিতা লিখতে শিখিয়েছে।”[১] এই স্বীকারোক্তি থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি কাব্যজগতে কবির অনুপ্রেরণা কোথায়। তারই ফল কবির একের পর এক কাব্যগ্রন্থ। যেখানে মেয়েরা তাঁর কবিতার অনেকটা স্থান জুড়ে রয়েছে। অনেকটা না বলে সবটাই অবশ্য বলা যায়।

কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত বেপরোয়া ও স্বাধীনচেতা। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র উৎসর্গপত্রে তাই নির্দ্বিধায় তিনি বলতে পারেন – 'যারা ভালোবাসে, যারা গালি দেয়।'[২] কবির কবিতায় পুরাণ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের মেয়েরাও স্থান পেয়েছে। কবি নিজেই বলেন – "আমার কবিতা ভুলে যাওয়া, উপেক্ষিত, ইতিহাসে বিলুপ্ত এইসব মেয়েদের সুখ-দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাসভঙ্গ, নিগ্রহ, যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। যে অভিজ্ঞতাগুলি আমার নিজেরও হতে পারত, কলম হাতে নিলেই যেন এতদিন ধরে প্যানডোরার ঝাঁপিতে আটকে থাকা অনুভূতি হুড়মুড় করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে খাতায়।"[৩] কবির স্বীকারোক্তিতেই ধরা পড়ে মেয়েদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার আত্মীকরণ করে তাকে কাব্যরূপ দিয়েছেন তিনি।

'কথামানবী' কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের এমন একটি কাব্যগ্রন্থ যাকে কবি বলেছেন একটি ইতিহাস গীতিকা। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে কবি লিখেছেন 'যুগান্তে'র অপর্ণা সেনকে। অপর্ণা সেনকে উৎসর্গ করতে গিয়ে কবি এখানে 'যুগান্তের' শব্দটিকে সংযোজন করেছেন। এই শব্দ সংযোজনাতেই কবির বক্তব্যের বিস্তৃত পরিধি যে কোথায় যারা কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতার সঙ্গে কমবেশি পরিচিত তারা সহজেই তা অনুমান করে নিতে পারেন। এই কাব্যগ্রন্থটির 'পূর্বকথা' অনুসারে আমরা বুঝতে পারি যে 'কথামানবী' একটি কবিতা। একটি বারোশো লাইনের আত্মকথন অথবা একটি অসমাপ্ত ইতিহাস দীপিকা। কবির ভাষায় আমরা বলতে পারি – "শৌর্যবীর্যের গল্পে ভরা ইতিহাস বইয়ের তলায় মেয়েদের যে গহন কাহিনী চাপা পড়ে আছে 'কথামানবী' তারই ভাষ্যকার।"[৪]

মল্লিকা সেনগুপ্তের 'কথামানবী' কাব্যে রয়েছে খনা, দ্রৌপদী, গঙ্গা, রিজিয়া, মেধা পাটেকর, মাধবী, মালতী, শাহবানু ও খনাদের কথা। এই কাব্যটির পরিকল্পনা যখন কবি করছিলেন, তখন ঢাকায় অদিতি ফাল্গুনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন – "এখন যে বইটি লিখছি – 'কথামানবী' - ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন সময়ের দশটি ধ্রুপদী নারীচরিত্র নিয়ে - এখানে দ্রৌপদী যেমন একটি চরিত্র, তেমনি শাহবানুও।"[৫] অদিতি ফাল্গুনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে দশটি ধ্রুপদী নারীচরিত্র নিয়ে 'কথামানবী' লিখছেন বললেও আমরা এই কাব্যে আটটি ধ্রুপদী নারীচরিত্রকে পাই। কাব্যটির প্রথমেই রয়েছে নান্দীমুখ। এই অংশটি কাব্যটির ভূমিকা বলা যেতে পারে। কবি এখানে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন –

> "সেই ইতিহাসে কোণঠাসা নারী আমরা
> শুরু করলাম কথামানবীর ভাষ্য।"[৬]

কবি এখানে ভাষ্য দিয়েছেন খনা, কল্পনা চাওলা, কুন্তী, সীতা, রূপ কানোয়ার, আনারকলি, মেধা পাটেকর, দ্রৌপদী, রূপান বাজাজের হয়ে। এই চরিত্রগুলোর সাথে তিনি একাত্ম হয়েছেন। তাই কবি বলতে পারেন –

> "শোনাতে এসেছি জনতার সভাকক্ষে
> নারীর ভাষ্য কথামানবীর ভাষ্য...।"[৭]

কবি বলেন, "আমার কবিতা গ্রামীণ পটচিত্রের মতো, মানুষ আর 'মেয়েমানুষে'র ছবিকথা লিখতে চেয়েছি। কথামানবীর মতোই ইতিহাসের ছাই এবং ভস্মের মধ্যে নারী নামক যে আগুন চাপা পড়ে আছে, আমি তারই ভাষ্যকার। আমি আগুনের আত্মকথন। আমি কান্না পড়ি, আগুন লিখি, নিগ্রহ দেখি, অঙ্গার খাই, লাঞ্ছিত হই, আগুন লিখি। আগুনের কথাকারকে কেউ সহজে মেনে নিতে পারে না, আমাকেও পারে না।"[৮]

কবি নিজের কবিতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তাঁর অনুভূতি অত্যন্ত প্রখর। প্রখর অনুভূতিসম্পন্ন স্পষ্টবাদী কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত তাই বলেন – "মেয়েদের মুখ থেকে কঠিন কথা শুনতে অনেকে অস্বস্তিতে পড়েন। তাদের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। আবার রাস্তায় এক অচেনা প্রৌঢ়ার সঙ্গেও দেখা হয়, যিনি চিবুক ধরে বলেন, তোমার লেখা পড়ি, তুমি আমাদের কথা বল। এদের জন্যই লিখি, লিখতে ভালো লাগে তাই লিখি।"[৯]

'কথামানবী' কাব্যগ্রন্থের পূর্বকথায় কবি লিখেছেন – "কথামানবী সেই নারী, যে যুগান্তের অপমান আর অবহেলার পরেও ভালবাসতে পারে, প্রতিবাদ করতে পারে, যে নতুন জন্ম নিয়ে ফিরে আসে দ্রৌপদী, গঙ্গা, সুলতানা রিজিয়া, মাধবী, মেধা পাটেকর, মালতী মুদি, শাহবানু বা খনার মধ্য দিয়ে, যে হেঁটে চলে যুগ থেকে যুগান্তরে, মিশে থাকে প্রতিটি ভারতকন্যার রক্তে, যে ইতিহাস এবং অনাগত, একক এবং সহস্র, অশ্রু এবং আগুন, যার শুরু আছে কিন্তু শেষ কোথায় সে নিজেও জানে না...।" [১০]

কবি বিশ্বাস করেন যে নারী টিপ পরে, সন্তানের যত্ন করে, সবাইকে ভালোবাসে, সেও প্রতিবাদ করতে জানে। তাই কবি বলেন, 'ভালোবাসলেও যুদ্ধ করুন', দেখতে নরম সরম হলেও লেখাটা যেন গরম হয়।"[১১] কারণ, না হলে সমানে সমানে টিকে থাকা যাবে না। তাই কবির বক্তব্য – "হে পুরুষ, হে আবহমানের সঙ্গী, যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমার কাছে কী ব্যবহার আশা করি, আমি বলবো মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার। ... তোমরা আমাদের ভালোবেসেছ, পীড়ন করেছ, মানুষ কিন্তু ভাবোনি, আমি তো প্রতিবাদ করবোই। তখনও করেছিলাম সেই যখন আমার নাম ছিল কৃষ্ণা, দ্রৌপদী, যাজ্ঞসেনী -

> "হস্তিনাপুরের এক গৃহবধূ, সেই আমি আবার জন্মেছি
> ভারতবর্ষের দিকে যে মেয়েটি এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল -
> স্ত্রীকে পণ রাখার রাখবার অধিকার কে দিল স্বামীকে?"[১২]

কবির 'দ্রৌপদীজন্ম' কবিতায় কবি মহাভারতের দ্রৌপদীর সাথে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের, অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন। আবার পাশাপাশি সাহসিনী দ্রৌপদীর প্রতিবাদকে তুলে ধরেছেন। কবির লেখনীতে মহাভারতের দ্রৌপদীর দুর্দশার সাথে যুগান্তের সমস্ত অপমানিত, অত্যাচারিত নারীদের অপমানকে এক করে প্রতিবাদিনী হয়েছেন। বলেছেন –

> "হে পুরুষ!
> রূপ দেখলেই কেন হাতের মুঠোয় চাও জ্যান্ত মানবীকে!
> না পেলে তারই শাড়ি টেনে ধরে অশ্লীল হাসিতে
> তার মুখ কালো করে দিতে চাও।"[১৩]

'দ্রৌপদীজন্ম'এর পরের কাহিনী কবিতা 'গঙ্গাজন্ম'। এই কবিতার শুরু মহাদেবের জটা থেকে নিঃসৃত দেবী গঙ্গার কথা দিয়ে। সেই স্বচ্ছ ও সুন্দর গঙ্গার কাঁচের মত জলে পাহাড়ী কন্যারা সকালে মুখ দেখে। কিন্তু সেই গঙ্গা যখন ক্রমশ সমতলে নেমে আসে বা জনপদে ঘিঞ্জি লোকালয়ে নেমে আসে তখন তার জলরাশি মানুষের ব্যবহারে ময়লা হয়। এই গঙ্গার সঙ্গে কবি মহাভারতের ধীবরকন্যা গঙ্গার প্রসঙ্গ এক করে উপস্থাপন করেছেন। মহাভারতের শান্তনু এই গঙ্গাকে দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল। তখন গঙ্গা শান্তনুর কাছে শর্ত দিয়েছিল স্বাধীনতার। বলেছিল –

"আমার ইচ্ছায় কখনো বাধা দিলে
জলের নারী আমি ফিরব জলে।"[১৪]

সেই গঙ্গার তীরেই সতীকে দাহ করানো হয়। জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় সদ্য বিধবাকে। গঙ্গাকে নিয়ে কবির লেখনী বহুধা বিস্তৃত। তাই কবি বলেন –

"গঙ্গা তোমাদের কন্যা যাকে রোজ
চাবুক মারা হয় শ্বশুর ঘরে।
গঙ্গা তোমাদের জননী রোজ যার
পায়ের তলা থেকে জমিটা সরে যায়।"[১৫]

তাই কবির আক্ষেপ যে গঙ্গা সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, সেই গঙ্গাকে কেউ বাঁচাতে পারছে না। তাইতো কবির লেখনী আশা করে আবার এক নতুন গঙ্গার জন্ম হবে।

এই কাব্যগ্রন্থের পরবর্তী কবিতা 'রিজিয়া জন্ম'। ইতিহাস অনুসারে দিল্লির সিংহাসনে একসময় আসীন ছিলেন রিজিয়া সুলতানা। রিজিয়ার বাপজান মারা যাবার আগে দিল্লির মসনদে বসিয়ে গিয়েছিলেন তার আদরের কন্যা রিজিয়াকে। কিন্তু আমীর-ওমরাহের দল রিজিয়ার মসনদে বসার ব্যাপারটা ভালো নজরে দেখেনি। ফলে তারা বিভিন্নভাবে রিজিয়াকে দিল্লির মসনদ থেকে চ্যুত করার জন্য চেষ্টা করে। তারা দিন গুণে রিজিয়া কাকে সাদি করবে, কে রিজিয়ার মালিক হবে, কে তার রাজ্যপাটের মালিক হবে। কারণ পুরুষ হয়ে তারা নারীর শাসনাধীনে থাকতে চায় না। ইয়াকুত জালাউদ্দিন রিজিয়া সুলতানাকে শাদী করতে চাইলে ওমরাহরা প্রচন্ড রেগে যায়। জালাউদ্দিন ও রিজিয়া পরস্পরের কাছাকাছি এলে আমীর-ওমরাহের দল বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সেই বিদ্রোহকে দমন করার জন্য রিজিয়া সুলতানাকে সৈন্য প্রেরণ করতে হয়। এর ফলস্বরূপ রিজিয়া সুলতানার শ্রেষ্ঠ বাদী সুন্দরী মরিয়মের ধর্ষিতা লাশ পাওয়া যায় হারেমের অন্ধকারে।

রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাস ছড়ায় বিদ্রোহীরা। ইয়াকুত বুঝতে পারে তার জন্যই এত অশান্ত হয়ে উঠছে দিল্লি। তাই সে রিজিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিতে চায়। কিন্তু রিজিয়ার হৃদয় বিচ্ছেদ মানতে চায় না। ফলে বিদ্রোহ বাড়তে থাকে। পরবর্তী সময়ে একদিন গভীর রাতে ইয়াকুতকে নিধন করে ঘাতক আলতুনিয়া। যাকে রিজিয়া সুলতানা পথ থেকে কুড়িয়ে এনে সুবেদার বানিয়েছিলেন। আলতুনিয়ার গোপন আশা ছিল সে রিজিয়াকে শাদী করবে। কাজেই রিজিয়াকে কব্জা করার জন্যই আলতুনিয়া ইয়াকুতকে হত্যা করে এবং রিজিয়াকে বন্দী করে। দিল্লির অধিশ্বরী রিজিয়ার সুলতানা দেখে যে তারই বেতনভোগী বান্দারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। শেষপর্যন্ত রিজিয়া সুলতানাও বিদ্রোহীদের হাতে মৃত্যুবরণ করে। 'রিজিয়া জন্ম' কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন রিজিয়ার বুকে যে ছুরিটা বিদ্ধ হলো সেই ছুরি আপাতদৃষ্টিতে রিজিয়াকে খতম করলেও আসলে সেই ছুরি বিদ্ধ হল রিজিয়ার মত সমস্ত মেয়েদের বুকে।

এই প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন – "ভারতবর্ষের মেয়েরা কোনওদিন রাজা হয়নি, প্রজাও হয়নি। হয়েছে রাজার বউ আর প্রজার বউ। সুয়োরানী দুয়োরানী আর ঘুঁটেকুড়ানি। একবার, শুধু একবার রাজা হয়েছিলাম, মাত্র কয়েকদিনের জন্য। আমি কথামানবী, হয়ে উঠেছিলাম সুলতানা রিজিয়া। দিল্লিশ্বরী। আঃ তারপর লোকজনের কি অশান্তি! একটা খুবসুরত জেনানা একা একা দিল্লির মসনদে বসে থাকবে, দিল্লির মরদদের

কাউকে বিয়ে না করে বাদশাহী চালিয়ে যাবে।এও কি সম্ভব! তাবড় তাবড় পুরুষেরা এরকম অনাসৃষ্টি কান্ড মেনে নেবে!
নাঃ মেনে নেয়নি।"[১৬]

কবি বলছেন যে মেনে নিলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। স্বাধীনতার এত বছর পরেও মহিলা বিল ফিরিয়ে দেন রাজনীতির পুরুষপুঙ্গবেরা। কবির ভাষায় – "মেয়েরা সমানে সমানে শাসন ক্ষমতা হাতে নেবে এই দৃশ্য দেখার চেয়ে তারা মরে যাবেন সেও ভি আচ্ছা। মেয়েদের আটকাতে হবে, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে বলে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন অমুকপ্রসাদ যাদবের দল। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে, যেমন চলছিল আমার রিজিয়া জন্মে..." [১৭] এখানেই কবি ইতিহাসের রিজিয়ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান।

গুজরাটের মেধা পাটেকরের কাহিনী স্থান পেয়েছে কবির 'মেধা জন্ম' কবিতাটিতে। একটি গ্রামকে বাঁচাবার জন্য লড়াই করেছিল যে মেয়েটি অফুরন্ত জেদ নিয়ে, অনশন শুরু করেছিল, দাবি করেছিল পুনর্বাসনের। যারা ক্যাম্পে জীবন যাপন করছিল তাদের জন্য লড়াই করেছিল মেধা পাটেকর। দেশের উন্নতির জন্য, দশের উন্নতির জন্য, দেশের সেচ ব্যবস্থা ভালো করার জন্য, নর্মদা নদীতে বাঁধ দিতে চায় সরকার। ফলে নদীর জল ভাসিয়ে নিতে চায় গ্রামকে। সেই গ্রামকে বাঁচানোর জন্য, সেই গ্রামের মানুষকে বাঁচানোর জন্য মেধা পাটেকরের যে লড়াই, সেই লড়াই নিয়েই কবির 'মেধা জন্ম' কবিতাটি লেখা। গ্রামের মানুষকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্য একসময় রিসার্চ করতে আসা মেধা পাটেকরের ঠিকানা হয়ে যায় মনিবেলি গ্রাম।কবির লেখনীতে মেধা পাটেকরের ভাষায় –

"গ্রাম মনিবেলি
নদী নর্মদা
এখন আমার
নিজের ঠিকানা।"[১৮]

মানুষকে উৎখাত করে যারা সভ্যতা গড়ে তাদের সঙ্গেই লড়াই মেধা পাটেকরের। নর্মদা বাঁধ যাদের সংসার ভেঙ্গে দিয়েছে তাদের পাশে নিঃস্বার্থভাবে দাঁড়িয়েছে মেধা পাটেকর।

পুরু রাজা যযাতির কন্যা মাধবীর কথা লিপিবদ্ধ করেছেন কবি তাঁর 'মাধবী জন্ম' কবিতায়। গুরুদক্ষিণা সঠিকভাবে দিতে না পেরে ক্ষত্রিয় রাজা সর্বসুলক্ষণা কন্যাকেই তুলে দেন গালবের হাতে। আর এক ক্ষত্রিয় রাজা পঁচিশ হাজার ঘোড়ার বদলে এক বছরের জন্য মাধবীর অধিকার পান। বছর ঘুরলে এক বছরের স্বামী আর নাড়ী ছেঁড়া শিশুকে ছেড়ে মাধবী পুণরায় পঁচিশ হাজার ঘোড়ার বদলে হস্তান্তর হন আর একজন রাজার কাছে। এভাবে তিনটি সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন মাধবীর আজ যেন 'ঘৃণা নেই, রাগ নেই, ভালবাসা নেই'।**১৯** এই কবিতাটি পড়লে মনে হয় নারীর যেন কোন নিজস্ব চাহিদা নেই, চিন্তা নেই, ইচ্ছা নেই। পুরুষশাসিত সমাজ তাকে যেভাবে চাইবে সেইভাবেই ব্যবহার করতে পারে। এখানেই প্রতিবাদিনী কবি মল্লিকা সেনের আপত্তি। সেজন্যই এই কাহিনী কবিতাগুলির মাধ্যমে কবি প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেন।

পুরুলিয়ার আদিবাসী মেয়ে মালতী মুদির কথা লিপিবদ্ধ করেছেন কবি তাঁর 'মালতী জন্ম' কবিতায়। মালতী তার উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছে, প্রতিবাদে পুরুষের বুকে ছুরি বসিয়েছে। কবি বলছেন –

"আজকে মালতী স্বয়ং দুর্গা

রাক্ষস মেরে এভাবে মেয়ে
বাঁচায় নিজেকে, মালতী মুদিকে
বাঁচাতে আসে না রাজার কুমার।"[২০]

খেটে খাওয়া সব মালতীকেই একা বাঁচতে শিখতে হয়। যদিও প্রথমে পুরুলিয়াবাসী খেটে খাওয়া মানুষগুলো মালতীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সবাই সরে যায়। কারণ তারা খেটে খাওয়া মানুষ, অশিক্ষিত মানুষ, গরীব মানুষ, সমাজের মূল স্রোতে প্রবেশ করতে না পারা মানুষ। মালতীর উপর থানা থেকে ডায়েরী তুলে নিতে চাপ দিতে থাকে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে। গ্রামের লোকেরাও যেন তাদের সুরে সুর মেলায়। মালতী একা হয়ে পড়ে। মালতীর পাশে তার বিপদের দিনে কেউই দাঁড়ায় না। এমনকি তার নিজের বাবা পর্যন্ত তার পক্ষে থাকে না। মালতীকে বলে ডায়েরি তুলে নিতে। কারণ 'বাবুদের সাথে যুদ্ধ চলে না'[২১] কিন্তু মালতী একাই বাঁচতে চেয়েছে নিজের মানসম্মান নিয়ে। তাই –

"মালতি ভাঙবে, মচকাবে না
সেই তো বাঁশের কঞ্চি
সে তো আগুনের ইন্ধন
পিলার টিলার জ্বালিয়ে দেবে সে
নিজে জ্বলে পুড়ে মরবে
ডায়েরী তোলার উদ্যোগ নেই।"[২২]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই মালতীকেই আগুনে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। আমাদের সমাজের অসংখ্য অসহায় মেয়েদের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে 'মালতী জন্ম' কবিতার মালতী মুদি।

১৯৮৫ সালে তালাকপ্রাপ্তা শাহবানুর স্বামীকে হাইকোর্ট খোরপোষের আদেশ দিলে তার স্বামী এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হয়েছিলেন। তুমুল আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই মুসলিম মহিলা শাহবানুর মনের ভাষা পড়তে পেরেছিলেন কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত। তাই শাহবানুর হয়ে মল্লিকার লেখনী বলে -

''বোরখা পরা বাইশ বছর
শামুক হয়ে কাটিয়েছিলাম
এখন হঠাৎ রোদের আলো
চোখে পড়তে অন্ধ দু'চোখ
খোলা হাওয়ায়, প্রখর তাপে
আনপুরুষের চোখের সামনে
বেঁচে থাকতে শেখাও নি যে
ভুলেই গেছ, ও শরীয়ত?''[২৩]

নিষ্ঠুর সমাজ যার জিভ কেটে নেয় সত্য বলার অপরাধে, সেই খনার কথা কবি বলেছেন তার 'খনা জন্ম' কবিতায়। একজন নারী জ্যোতিষচর্চা করবে সেটা তার স্বামীর পক্ষেও যেন মেমে নেওয়া অসম্ভব ছিল। তাই তো খনার ঘরের লোক তাকে নির্দেশ দেন –

"আর না যেন দেখি তোমায়

জ্যোতিষ চর্চাতে
এখন থেকে তোমার কাজ
বেগুন আলু ভাতে।" [২৪]

১৯৬০ সালের ২৭শে মার্চ কলকাতায় জন্ম হয়েছিল কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের। এখন পর্যন্ত কবিতার বই বেরিয়েছে চৌদ্দটি, উপন্যাস লিখেছেন দু'টি, নারীচেতনা বিষয়ক বই দু'টি এবং অনুবাদের বই বেরিয়েছে একটি। ১৯৯৭ সালে পেয়েছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিনোদন বিচিত্রা পুরস্কার, ১৯৯৮ সালে সুকান্ত পুরস্কার, ২০০৪ সালে বাংলা আকাদেমী অনিতা-সুনীল বসু পুরস্কার ও কেন্দ্রীয় সরকারের জুনিয়র রাইটার্স ফেলোশিপ। কবিতা পড়ার আমন্ত্রণে গিয়েছেন সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও বাংলাদেশে। কবির দুর্বার লেখনী যেন থামতে জানে না। কারণ, তিনি কথামানবী। যুগ যুগ ধরে তিনি লিখে চলেছেন। তিনি গার্গী, তিনিই মৈত্রেয়ী, তিনি উনিশ শতকের রাসসুন্দরী দেবী, যিনি খাটের নীচে গোপনে বসে আত্মকথা লিখতেন, কেউ দেখে ফেললে নিন্দে করবে বলে। তিনি মহাশ্বেতা, কোন প্রতিকূলতাই যার লেখনীকে আটকে রাখতে পারে না। তিনি খনা, নিষ্ঠুর সমাজ যার জিভ কেটে নেয় সত্য বলার অপরাধে। জন্মান্তরে আবার তিনিই কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত, সত্যকে তুলে ধরার জন্যই যার আবির্ভাব, তাঁর লেখনীর টুঁটি চেপে ধরবে এমন সাধ্য কারো নেই।

তথ্যসূত্র:

১) সেনগুপ্ত, মল্লিকা, 'পূর্বকথা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', পৃঃ ০৭।
২) তদেব, 'উৎসর্গপত্র', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', পৃঃ ০৫।
৩) তদেব, 'পূর্বকথা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', পৃঃ ০৭।
৪) তদেব, 'পূর্বকথা', 'কথামানবী', পৃঃ ০৪।
৫) সরকার, সুবোধ, সেনগুপ্ত, মল্লিকা, 'সুবোধ-মল্লিকা স্কোয়ার', পৃঃ ১৬৫।
৬) সেনগুপ্ত, মল্লিকা, 'নান্দীমুখ', 'কথামানবী', পৃঃ ০৬।
৭) তদেব, 'নান্দীমুখ', 'কথামানবী', পৃঃ ০৬।
৮) তদেব, 'পূর্বকথা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', পৃঃ ০৭।
৯) তদেব।
১০) সেনগুপ্ত, মল্লিকা, 'পূর্বকথা', 'কথামানবী', পৃঃ ০৪।
১১) সেনগুপ্ত, মল্লিকা, 'কথামানবী', পৃঃ ০৮।
১২) তদেব, 'দ্রৌপদীজন্ম', 'কথামানবী', পৃঃ ০৯।
১৩) তদেব, পৃঃ ১১।
১৪) তদেব, 'গঙ্গাজন্ম', 'কথামানবী', পৃঃ ১৭।
১৫) তদেব, পৃঃ ১৯।

১৬) সেনগুপ্ত, মল্লিকা, 'কথামানবী', পৃঃ ২১।
১৭) তদেব।
১৮) তদেব, 'মেধা জন্ম', 'কথামানবী', পৃঃ ৩২।
১৯) তদেব, 'মাধবী জন্ম', 'কথামানবী', পৃঃ ৪২।
২০) তদেব, 'মালতী জন্ম', 'কথামানবী', পৃঃ ৪৬।
২১) তদেব, পৃঃ ৫১।
২২) তদেব, পৃঃ ৫০-৫১।
২৩) তদেব, 'শাহবানুর জন্ম', 'কথামানবী', পৃঃ ৫৫।
২৪) তদেব, 'খনা জন্ম', 'কথামানবী', পৃঃ ৬৩।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) সেনগুপ্ত, মল্লিকা, 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু', ভাইরাস পাবলিকেশন, কৃষ্ণনগর, ১৯৮৩।
২) তদেব, 'সোহাগ-শর্বরী', অভিমান, হাওড়া, ১৯৮৫।
৩) তদেব, 'কথামানবী', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯।
৪) তদেব, 'পুরুষকে লেখা চিঠি', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯।
৫) তদেব, 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯।
৬) তদেব, 'মল্লিকা সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা', দেশ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫
৭) তদেব, 'পুরুষের জন্য একশো কবিতা', পাবলিশিং প্লাস, কলকাতা-৬।
৮) সরকার ও সেনগুপ্ত, সুবোধ ও মল্লিকা, 'সুবোধ-মল্লিকা স্কোয়ার', বিকাশ গ্রন্থ ভবন, কলকাতা-৯।